২৯-১২-০৭

দৈনিক দিনকাল
THE DAILY DINKAL

মন্তব্য

দুর্নীতির কারণ ও তা দমনের উপায়

ড. এম আজিজুর রহমান

আইন-শৃংখলা ভঙ্গ করে, নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অবৈধভাবে অন্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সরকারি সম্পদ ও অর্থ সম্পদ দখল, আত্মসাৎ, সামাজিক শক্তি, প্রতিপত্তি ও সুনাম অর্জনের অপচেষ্টা, নিকট-আত্মীয় ও আশীর্বাদপুষ্ট লোককে অতিরিক্ত খাতির করা এবং অনিয়মিতভাবে ব্যবসায় বা চাকরি ও পদোন্নতি দেয়া এগুলো সবই হলো দুর্নীতি।

মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় নানা কারণে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও দরিদ্র দেশ। এদেশের ১৪ কোটি লোকের প্রায় ৫০% লোক দরিদ্র। এদের মধ্যে বেশিরভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, যারা জঠরের জ্বালা নিবৃত্তির জন্য দুর্নীতি করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকেই আছে যারা বর্তমান ভালো অবস্থা থেকে আরো ভালো অবস্থায় যাওয়ার জন্য, আরো স্থাবর-অস্থাবর অর্থ- সম্পদ অর্জনের জন্য, অবৈধভাবে নামী-দামী ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক অবস্থানের জন্য দুর্নীতি করে থাকে।

আমাদের দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুর্নীতিমুক্ত না হলেও অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতি করে থাকে। তারা বর্তমানে দুর্নীতিযুক্ত পারিপার্শ্বিকতার কারণে তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রত্যাশায় দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাচ্ছে।

দুর্নীতির কারণ বহুবিধ হলেও সহজেই কিছু প্রধান কারণ শনাক্ত করা যায়। ধর্মের প্রতি ভীতি ও অনুরাগের অভাব এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের কারণে মানুষ অতি সহজেই দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলতে এখন আর তেমন কিছু আমাদের নেই। ক্রমাগত আমরা যেন সভ্যতা থেকে দূরে সরে গিয়ে অসভ্য সমাজের দিকে যাত্রা করছি। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মায়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সম্মানবোধ হ্রাস পাচ্ছে। কে কার ক্ষতি করে নিজেকে উপরে উঠাবে এ অশুভ প্রতিযোগিতায় মানুষ ব্যস্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, আইন না মানা, পুলিশ প্রশাসনের অনিয়ম ও দুর্বলতা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন বহির্ভূত বিচারের রায় প্রদান, আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া দুর্নীতির জন্য দায়ী। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও দুর্নীতির বিচার না হলে স্বার্থপর ও অর্থলিপ্সু মানুষ স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায় কেন দুর্নীতি করবে না সেটিও ভেবে দেখার বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি আইনের বিধান থাকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে, কিন্তু মানুষ যখন দেখে কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাচ্ছে না তখন আইনের শাসনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভয় কিছুই থাকে না। তাই বলা যায় আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব ও বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা স্বার্থপর মানুষকে দুর্নীতির পথে পরোক্ষভাবে এগিয়ে দেয়।

একটি দেশের সভ্যতা নির্ণয় করা হয় যেসব মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে তার মধ্যে অন্যতম হলো দেশটির বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন কিনা। এদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ছিল না। বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন না থাকায় দুর্নীতি দমনে সমস্যা হচ্ছিলো। এখন আমাদের বিচার বিভাগ স্বাধীন। এখন এই বিভাগের সর্বস্তরের বিচারকগণ যদি সৎ ও আন্তরিক হন, তবে অবশ্যই আমরা দুর্নীতি দমনে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো।

> দুর্নীতি বৃক্ষের পরবর্তী শাখাটি হলো এদেশের বেশ কিছু আমলা, পুলিশ প্রশাসনসহ সিভিল সার্ভেন্ট বা সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী শ্রেণী। ছোট হোক বা বড় হোক প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট চাকরিজীবীরা দুর্নীতির সাথে জড়িত।

বাংলাদেশের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, সরকার, সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী, আমলা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ কমবেশি প্রায় সবাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। সবার উদ্দেশ্য হলো স্বল্প শ্রমে কিভাবে অধিক অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া যায়, বিনা পরিশ্রমে কিভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ আহরণ করা যায়। দুর্নীতির মূল উৎস গ্রোথিত আছে আমাদের দেশের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদের ক্ষমতা অর্জন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার মানসিকতার মধ্যে। নির্বাচনে প্রতিযোগিতার জন্যে এবং পরবর্তী ভোটকালীন প্রয়োজনের জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে হয়। ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ সম্পদ অর্জনের জন্য তারা স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দলীয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, বিভিন্ন সংস্থা, আমলা প্রমুখকে দুর্নীতি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে কমবেশি গোটা দেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলে।

দুর্নীতি বৃক্ষের পরবর্তী শাখাটি হলো এদেশের বেশ কিছু আমলা, পুলিশ প্রশাসনসহ সিভিল সার্ভেন্ট বা সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী শ্রেণী। ছোট হোক বা বড় হোক প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট চাকরিজীবীরা দুর্নীতির সাথে জড়িত। এরা দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, উৎকোচ, বকশিশ, পদোন্নতি, আত্মীয় স্বজনকে চাকরি দেয়া, বেশি বেতন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধা পেতে চান। আবার অনেক সময় তারা রাজনৈতিক চাপ সামলাতে গিয়েও দুর্নীতি করতে বাধ্য হন। এ সব উৎকোচ বা অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা না দিলে দেশের ব্যবসায় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সংশ্লিষ্ট ফাইল ও ব্যবসায়িক সংক্রান্ত যত রকম কার্যক্রম থাকতে পারে তা সচল হয় না। চাকরিজীবীদের দুর্নীতির কার্যক্রম ও এর অসৎ প্রয়োগের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো লাল ফিতার দৌরাত্ম্য।

আবার এমন অনেক ব্যক্তি পাওয়া যায় যারা শুধুমাত্র প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে দুর্নীতি করে। যেমন উৎকোচ গ্রহণ না করেও শুধুমাত্র অন্যের ভাল সহ্য করতে না পেরে অনেক সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী অযথা ফাইল আটকে রাখে, যোগ্য লোককে চাকরি বা প্রমোশন দিতে চায় না ইত্যাদি। প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক সব দেশেই আছে। দরিদ্র দেশে এদের সংখ্যা বেশি। এটিই প্রতিহিংসা তত্ত্ব। প্রতিহিংসা তত্ত্বের কারণে মানুষ সব সময় তার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাকে অন্য ব্যক্তির সাথে তুলনা করে। একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি যখন দেখেন তার পাশের লোকটি অবস্থাসম্পন্ন ও সুস্থ তখন তিনি অন্যের ভালো দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার যখন দেখেন তার পাশের লোকটি তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম অবস্থাসম্পন্ন ও অসুস্থ তখন তিনি রীতিমতো সুখী ও সুস্থ বনে যান। অর্থাৎ প্রতিহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি সামাজিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের একটি বড় ধরনের বাধা ও শত্রু। এ সব প্রতিসিংসুক ব্যক্তির কারণে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড স্থগিত বা অস্বাভাবিকভাবে বিলম্বিত হওয়ায় দেশ ও জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্নীতি বৃক্ষের তৃতীয় বৃহৎ শাখাটি হল শিল্প, শিল্পপতি ও সব রকমের ব্যবসায়ীবৃন্দ। অনেকে বলতে চান এরাই সমাজের সবচেয়ে বড় এবং গলাকাটা দুর্নীতিবাজ। এর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তিসংগত কারণও আছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় অর্জনের জন্যে ব্যবসায়ীদের দেশের রাজনীতিবিদ, আমলা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের কম বেশি লভ্যাংশ, উৎকোচ ও বখশিশ দিতে হয় বিধায় তাদের অনেক সময় দুর্নীতি করতে বাধ্য হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একজন ব্যবসায়ী যদি সারা বছরের জন্যে এক কোটি টাকার কাজ করে শতকরা ১০ ভাগ লভ্যাংশ হিসেবে পুরোটা অর্জন করতে পারে তাহলে তার দুর্নীতি করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ব্যবসায়ীবৃন্দকে দেশের সুই-সুতো থেকে শুরু করে ওষুধপত্র সবকিছুই তৈরি বা আমদানী করতে হয়। তারাও সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থপর। তারা তাদের স্বার্থ উদ্ধার ও লভ্যাংশের জন্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। জনগণ ও বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত করের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বেশিরভাগ দায়দায়িত্ব এখনও সরকারই বহন করে। যে সব খাতে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ বেড়েই চলেছে তা হলো সাধারণ মানুষ ও ভোক্তাদের সর্ব রকমের দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করা, আমদানি করা এবং উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির আদলে তা দেশব্যাপী সরবরাহ করা। তারা দেশে উৎপাদিত মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি অধিক মূল্যে বিদেশে রফতানি করে সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, দুর্নীতি প্রায় সর্বস্তরে সবার মাঝে বিরাজ করছে এবং দুর্নীতি দমনে আমাদেরকে বহুবিধ পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন-মানুষের নৈতিকতা, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে হবে; দেশে শিক্ষার হার বাড়াতে হবে; বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করতে হবে, সৎ, চরিত্রবান, ধার্মিক ও আইনের শিক্ষায় শিক্ষিত লোককে বিচার বিভাগে নিয়োগ করতে হবে; স্বল্প সময়ে বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হবে, আইনের দুর্বলতা থাকলে তার যথাযথ সংস্কার করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আইন শৃংখলা রক্ষার্থে আরো কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও রাজনীতিবিদদের অঙ্গীকার রক্ষার দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে হবে; আমলা ও সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়বদ্ধতা ও জাবাবদিহিতা বাড়াতে হবে এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের মাধ্যমে সব রকমের অসৎ উপার্জনের পথ বন্ধ করতে হবে। সামাজিকভাবে ব্যবসায়ীদের জন্য তাদের স্বীকৃত লভ্যাংশ প্রদানের সুব্যবস্থা করতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি করার এবং কর ফাঁকি দেয়ার সব রকমের পথ রুদ্ধ করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম-মর্যাদাশীল একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।